ডক্টরেট: জ্ঞানের গোঁসাই/অচেনা বামুনের পৈতা

ফাহমিদুল হক

আমার দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা, একদিন পিএইচডি করবো এবং তারপরে পিএইচডির রাজনীতি নিয়ে বড়ো প্রবন্ধ লিখবো। পিএইচডি করার পূর্বেই এর রাজনীতি নিয়ে মাঠে নামাটাকে অনেকে পিএইচডি করতে অসমর্থ লোকের ঈর্ষামাখা কাতরোক্তি বলে ভেবে নিতে পারেন বলেই, এতোদিন কিছু লিখি নি। কিন্তু পিএইচডি করাটাও ঠিক হয়ে উঠছে না। তাই এখন মনে হচ্ছে পিএইচডি করি বা না করি একটি নাতিদীর্ঘ নিবন্ধ এখনই লিখে ফেলা যায়। কারণ পিএইচডির সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দেবার পর আমি যখন সিজন্ড টিম্বার হয়ে যাবো, তখন এই শিরোনামের কিছু লিখতে গেলে, এই ভাবনাগুলো থেকেও রস ঝরে গিয়ে তা আরেকটি নিরস অভিসন্দর্ভে রূপ পাবে। অতএব টাটকা থাকতেই ভাবনাগুলো ডাউনলোড করা ভালো। পেয়ারা ডাঁসাই ভালো। নারিকেলে শাঁস থাকে, কিন্তু তার পানি ডাবের মতো মিষ্টি হয় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছি প্রায় আট বছর। এই আট বছরে অসংখ্যবার আমার শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে একটা প্রশ্ন শুনেছি।

– কী, লেখালেখি করছো না?

– চলছে টুকটাক, গত মাসে একটা গল্প ছাপা হয়েছে আর গত বইমেলায় ...

– আরে ঐ লেখালেখি না, বাইরে লিখছো না, পিএইচডির জন্য?

– নাহ্ ও সম্ভবত আমার কম্মো নয় ...

আমি শুভানুধ্যায়ীর প্রশ্নটা প্রথমেই বুঝতে পারি, কিন্তু মজা পাবার জন্য কথা চালিয়ে যাই। শুভানুধ্যায়ীরা আমাকে ভালোবাসেন, আমার ভালো চান, তাই পিএইচডি বঞ্চিত আমাকে তারা দেখতে চান না। বয়স ৩০/৩৫ বছর পার হয়ে যাবার পরও কেউ বিয়ে না করলে যেধরনের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে দেখা যায়, এক্ষেত্রে উদ্বেগটা তেমনই। বলা বাহুল্য, শুভানুধ্যায়ীদের এই উৎকণ্ঠা হৃদয়ে সবসময় প্রসন্ন ভাব আনে না।

রাজনীতিটা এভাবেই চালু থাকে, যে পিএইচডি না করলে 'মাষ্টার' কখনো সত্যিকারের 'টিচার' হয়ে উঠতে পারে না। তা আপনি বাইরে লেখালেখি করে, এডমিশন নিয়ে, স্কলারশিপ নিয়ে চার-দশ বছরব্যাপী গো-এষণা করে অশ্বডিম্ব বা মনুষ্যমল অথবা পাতিহাসেরডিম (পিএইচডি) যাই পয়দা করুন না কেন, কেউ অডিট করতে আসবে না। আপনার পিএইচডি না থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় আপনি অচ্ছ্যুৎ, বিপন্ন।

পিএইচডির মধ্যে আবার ভালোমন্দ আছে। আমেরিকা-কানাডায় করলে তার কদর এক রকম, ইংল্যান্ডে-অস্ট্রেলিয়ায় করলে আরেক রকম, ইউরোপের অন্যান্য দেশে করলে আরেক রকম। এই তিনটি বৃহৎ জায়গা থেকে পিএইচডি করলে আপনি এলিট-পিএইচডি ক্লাবে যোগ দিলেন। আর

এশিয়ার কোনো দেশে করলে, বিশেষত ভারতে করলে আপনার সম্পর্কে ধারণা করা হবে: উমহু, বিদেশে পিএইচডি হলো বটে, কিন্তু একেবারে ঘরের কাছে! আর দেশে পিএইচডি করলে তো আপনি প্রলেতারিয়েত ডক্টরেট। অস্তিত্বের/আত্মপরিচয়ের এই সঙ্কটে পড়ে দেশি ডক্টরেটরা দ্রুত ও অবশ্যম্ভাবীরূপে নামের আগে 'ড বিসর্গ' লাগান। বিদেশ থেকে করা পিএইচডি-এলিটরা অবশ্য চাইলে 'ড বিসর্গ' না লাগিয়েই দিব্যি চলাফেরা করতে পারেন। তাদের আত্মপরিচয়ের সঙ্কট নেই। আরেক ধরনের প্রলেতারিয়েত ডক্টরেট ছিলেন, সাবেক সোভিয়েত ফেরত তারা। তারা ডক্টরেট করে দেশে বাড়তি সমাদর পেতেন না, কারণ এই দেশটি পুঁজিতান্ত্রিক।

দেখা যাচ্ছে কোত্থেকে পিএইচডি করলেন, সেটাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। আপনার সহকর্মীরা, ছাত্র-ছাত্রীরা, সমাজের লোকজন, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, সর্বোপরি দাতাগোষ্ঠী ও এনজিওরা– যারা পিএইচডি ডিগ্রিধারীদের কনসাল্টেন্ট হিসেবে বরণ করে নিতে উদগ্রীব হয়ে থাকে– এদের সবার কাছে আপনার কদর নির্ভর করবে আপনি কোত্থেকে পিএইচডি করলেন তার ওপর। কী কাজ করলেন, আপনার নিজ জ্ঞানকাণ্ডে কী নতুন যোগ হলো, মানবেতিহাসের অগ্রগতিতে কতটুকু অবদান রাখতে পারলো আপনার কাজটি– এসব কেউ বিবেচনায় আনবে না। দেশে বসেও কিংবা ভারতে গিয়েও যে যুগান্তকারী গবেষণা করা সম্ভব এবং নর্থ আমেরিকায় গিয়েও যে আবর্জনা উৎপাদন হতে পারে– পিএইচডির পলিটিক্স সেই সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয়। এই গেলো রাজনীতির একটি দিক। এবার আরেকটি দিকে আলো ফেলা যাক। দেখা যায়, পিএইচডি করে আসার পরও একজন ডক্টরেটের সহকর্মী/বন্ধুরা জানতে পারেন না তিনি কী বিষয়ে জ্ঞানার্জন করলেন। তিনি ফিরে আসার পরে সেটা নিয়ে কারও সঙ্গে কোনো আলোচনা করেন না, কোনো সেমিনার দেন না, এমনকি তাকে ঘিরে বিভাগীয় মিটিঙে কোনো কোর্সও যেমন অফার করা যায় না তেমনি বিদ্যমান কোনো কোর্সই এই নব্যবিশেষজ্ঞের হাতে পুরোপুরি ছেড়ে দেয়া যায় না। এর কারণ কী? এর কারণ হলো দুটো: এক, তার অভিসন্দর্ভটি অন্যকে দেখানোর মতো কিছু হয়নি, একেবারে যাচ্ছেতাই ধরনের, দুই, তিনি এমন একটি বিষয়ে পড়ে এসেছেন যার কোনো সংশ্লিষ্টতা দেশীয় প্রেক্ষাপটে, বিভাগীয় সিলেবাসে নেই।

কিন্তু তিনি এরকম একটি সম্পর্কহীন বিষয়ে তিনি কেন গবেষণা করতে গেলেন? এই জায়গায় এসে জ্ঞানের জগতের আন্তর্জাতিক রাজনীতিটা আরও প্রকটিত হয়ে ওঠে। আপনি বেশিরভাগ সময়েই আপনার পছন্দ মতো বিষয়ে ফান্ড/স্কলারশিপ পাবেন না। আপনি হয়তো যথেষ্ট পুরুষতান্ত্রিক, আপনি পড়তে গেলেন জেন্ডার স্টাডিজ। আপনি হয়তো প্রগতিশীল বামপন্থী, পড়তে গেলেন মার্কেট লিবারাইজেশনের ওপরে– ফিরে এসে আপনি হবেন বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের কনসাল্টেন্ট। আপনি পলিটিক্যাল ইকোনমির ধারায় পড়তে চান, কিন্তু এরকম কোনো প্রোগ্রামের অফার আপনি পশ্চিমা দেশগুলোতে সচরাচর পাবেন না। আর নিজে ঐ ধারায় কোনো প্রপোজাল দিলে আপনি এডমিশন পাওয়া বা ফান্ড পাওয়ার সম্ভাবনা কমই থাকবে। কেউ কেউ অবশ্য এরমধ্যেই কিছু একটা পেয়ে যান, তারা ভাগ্যবান। শোনা যায়, আমেরিকায় পলিটিক্যাল ইকোনমি নিয়ে পড়াশোনা হয়, তবে সেটা নাকি আবার কার্ল মার্কস ধারার পলিটিক্যাল ইকোনমি নয়, ভিন্ন কোনো বস্তু। জাপানে বায়োলজিকাল সায়েন্সে যারা ফান্ড পেয়ে যান এবং ফিরে আসেন প্রচুর অর্থ ও একটি ডিগ্রি নিয়ে– তারা নাকি নিজেই বুঝতে পারেন না, কী পয়দা করে এলেন। কারণ তিনি যে প্রফেসরের অধীনে পিএইচডি করেছেন, তিনি আবার কাজ করছেন বড়ো কোনো কোম্পানির বিরাট এক প্রজেক্ট নিয়ে। সেই বড়ো প্রজেক্টের বেশ কয়েকজন নাট-বল্টুর মতো তিনিও একটা কিছু বের করে দেন, প্রফেসর সবগুলো বল্টু জোড়া দিয়ে একটা প্রজেক্ট নামিয়ে ফেলেন।

তো হরেদরে এরকম পিএইচডিই হচ্ছে। আর এরকম একটি পিএইচডি নিয়ে আপনি দিব্যি করে কেটে খেতে পারেন। আপনি দ্রুত প্রফেসর/অধ্যাপক হতে পারবেন। ধরুন এক পিএইচডি দিয়ে পিএইচডিবিহীন একজনের চেয়ে দ্রুত আপনি সহযোগী অধ্যাপক হলেন, ঐ একই পিএইচডি দিয়ে অধ্যাপকও হলেন– পিএইচডিবিহীন একজনের চেয়ে কয়েক বছর এগিয়ে গেলেন আপনি। উপরি পাওনা হিসেবে সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করবেন আর কনসাল্টেন্সির বাজারে দাপট দেখিয়ে যথেষ্ট অর্থের মালিকও হতে পারবেন। এই মূল ধারার পিএইচডিধারীদের মধ্যে একটি বিরাট অংশই আবার সারা জীবনে ঐ একটি পিএইচডি ছাড়া আর কিছুই করেন নি। পিএইচডির আগে তিনি এমন কিছু লেখেন নি, যা তার ডিসিপ্লিনে নতুন কিছু যোগ করেছে বা জ্ঞানের জগতে আলোড়ন তুলেছে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েই, নিজের ডিসিপ্লিনকে ভালোভাবে না বুঝেই, টোয়েফল, জিআরই (এক শিক্ষক এর পূর্ণরূপ করেছেন 'গর্দভ রিহ্যাবিলিটিশন এক্সাম'), আইএলটিএস-এ ভালো স্কোরের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন, একে ওকে ধরে একটি প্রপোজাল রেডি করেন এবং অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ মেরে আসেন। ফিরে এসেও তার বিশেষ কোনো অগ্রগতি হয় না, নিজের ডিসিপ্লিনের জন্য, দেশের অগ্রগতিতে কাজে লাগে এরকম নতুন কোনো গবেষণায় তিনি মনোযোগী হন না, হয় বিগ ইউনিভার্সিটি বা বিগ প্রফেসরের নাম আউড়ে অলস সময় পার করে দেন, নয়তো ভাড়াটে গবেষক হয়ে অর্থোপার্জন করেন। এর আগে পরে অবশ্যই তিনি গবেষণাধর্মী কিছু কাজ করেন, ঠিক গুনে গুনে 'রিকগনাইজড জার্নাল'-এ ততগুলো 'আর্টিকেল'ই ছাপেন যা তার প্রমোশনের প্রয়োজনে লাগে। তার মতো অন্য অনেকের প্রমোশনমুখী আর্টিকেল নিয়ে প্রকাশিত রিকগনাইজড জার্নালগুলোর দশাও লক্ষ করার মতো। বিনামূল্যে শিক্ষকদের দেয়া হলেও তারা নিজের লেখা না থাকলে ঐ জার্নালের কপি নিজের কাছে রাখেন না। সেরদরে বেচে দেন। পরিহাসের বিষয় হলো এইসব জার্নাল কোনো বিদ্যাভবনে নয়, নীলক্ষেতের পুরনো বইয়ের দোকানগুলোতে সবচেয়ে বেশি দেখতে পাওয়া যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত শিক্ষক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার, বিজ্ঞানী সত্যেন বোস, জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক, ভাষাবিজ্ঞানী আব্দুল হাই, নাট্যকার মুনীর চৌধুরী, দর্শন-লেখক সরদার ফজলুল করিমের কোনো পিএইচডি ছিলো না। কবি-লেখক-সম্পাদক ও বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বুদ্ধদেব বসুরও পিএইচডি ছিলো না। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, আনু মুহাম্মদের পিএইচডি নেই। এরকম নাম আরও অনেক পাওয়া যাবে। অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক পিএইচডি করতে গিয়েও শেষ না করে ফিরে এসেছেন। জিনিসটা তার ধাতে সয় নি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবিতদের মধ্যে নানা ধরনের অবদানের মাধ্যমে বিখ্যাত হয়েছেন এরকম অনেক শিক্ষকদের কারোরই পিএইচডি নেই। হাসান আজিজুল হক অস্ট্রেলিয়ায় কী একটা করতে গিয়ে কয়েক মাস থেকেই চলে এসেছেন। তারও ধাতে সয় নি। সনৎ কুমার সাহার বেলায়ও একই কথা খাটে। অস্ট্রেলিয়ার মোনাশ ইউনিভার্সিটির সিনেমা স্টাডিজের সিনিয়র লেকচারার ডেভিড হানানের কোনো পিএইচডি নেই, কিন্তু তার অধীনে বেশ কয়েকজন পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছেন। এরকম অনেক উদাহরণ দেশেও রয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে জ্ঞানকান্ডে কিছু যোগ করতে চাইলে পিএইচডি অত্যাবশ্যকীয় কোনো শর্ত নয়। বরং পিএইচডি করার পরে আর কিছু উৎপাদন না করতে পারার ভুরি ভুরি উদাহরণ আমাদের আশেপাশে আছে।

তবে আমি পিএইচডি করাটাকে মোটেই খাটো করে দেখছি না। আমার আপত্তি হলো পিএইচডিকে ঘিরে যে রাজনীতি জারি আছে তার বিরুদ্ধে। নোম চমস্কি পিএইচডি করেছিলেন হিব্রু ভাষার ওপরে, কিন্তু তার সারা জীবনের কাজ আর কেবল হিব্রু ভাষায় আবদ্ধ থাকে নি। বরং তিনি ভাষাতত্ত্বের একটি পৃথক ধারা তৈরি করেছেন। হয়েছেন আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশ্লেষক ও যুক্তরাষ্ট্রের

পররাষ্ট্রনীতির কট্টর সমালোচক, পরিণত হয়েছেন ‘জীবিতদের মধ্যে সবচাইতে উদ্ধৃত’ ব্যক্তিতে। এক্ষেত্রে হয়তো পিএইচডি তাকে সহায়তা করেছে কীভাবে গবেষণাকর্ম করতে হয় তার উপায় বাৎলে দিয়ে, যদিও জগতের অনেক বড়ো বড়ো গবেষক ও আবিষ্কারকের পিএইচডি করে গবেষণা-পদ্ধতি শেখার দরকার পড়ে নি। কিন্তু আমাদের সমাজে পিএইচডি করে সারাজীবন সেটা ভাঙ্গিয়ে চলার রীতিটি খুবই বিপজ্জনক। এক সহকর্মীকে বলতে শুনলাম, ষন্ডের যেমন গুঁতোগুঁতি করতে দুটো শিঙ লাগে, মাস্টারদেরও এখানে ওখানে মাথা গলানোর জন্য দরকার একটি পিএইচডি-শিঙ। পিএইচডির রাজনীতির সঙ্গে কলোনিয়াল একটি অনুষঙ্গ ইংরেজি ভাষার রাজনীতিও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিদেশে আপনাকে ইংরেজিতে গবেষণা করতে হবে, তাই আপনাকে ভালো ইংরেজিও জানতে হবে। ভালো কথা, আপনি টোয়েফল জিআরই দিয়ে এলিট ইউনিভার্সিটির সন্তুষ্টি অর্জন করলেন। কিন্তু ইংরেজি ইংরেজি করে যে আপনি বাংলায় লিখতে ভুলে গেলেন। এটা বলতেও তো কেমন গর্বভাব মনে জাগে: “আমি বাংলায় লিখি না!” ভাই আপনি ফিরেছেন বাংলাদেশে, এদেশে বেশিরভাগ লোক ইংরেজিতে প্রবন্ধ পড়ে না, আর ইংরেজিতে লিখে আপনি দাবি করছেন দেশকে বিরাট কিছু দিলেন!

তবে বিদেশে কাজ করতে গেলে একটি অন্য সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটে, নিজ দেশ নিজ সংস্কৃতিকে ভালোভাবে বোঝার জন্য যে দূরত্ব তৈরি হয়, সেই দূরত্ব কিছুদিন বাইরের থাকার পর ঘরে ফিরে এসে ঘরকে, দেশকে নতুন করে আবিষ্কারের সুযোগ হয়তো করে দেয়। একটি উন্নত একাডেমিক পরিবেশে কাজ করার অভিজ্ঞতা তাকে দেশে ফিরে নিজ ডিসিপ্লিনের জন্য ও নিজ দেশের জন্য অবদান রাখতে উদ্বুদ্ধ করে। অনেকে সেই অর্জনকে কাজে লাগিয়ে দেশে ফিরে জ্ঞানকান্ডকে অনেক সমৃদ্ধ করেছেন, বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই লিখেছেন। তার গবেষণার ফলাফল নীতিনির্ধারকদের নানাভাবে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তাও করেছে। ড. জামাল নজরুল ইসলাম, ড. হারুন উর রশিদ, ড. মুহাম্মদ ইউনুস, ড. আহমদ শরিফ, ড. হুমায়ুন আজাদ, ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এরকম আরও অনেকের নাম করা যায় যারা তাদের পিএইচডির অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আরও অনেক অনেক কাজ করেছেন, করেছেন সারা জীবন ধরেই। আমার এই নিবন্ধটি তাদের নিয়ে নয়। আমার এই নিবন্ধটি সেইসব জ্ঞানের গোঁসাইদের নিয়ে, সেই বামুন অথবা বামনদের নিয়ে যাদের ঐ পিএইচডি-পৈতেটা না থাকলে আর কেউই চিনতো না, আর কোনো পরিচয়েই তাদের পরিচিত করানো যেতো না। অথচ এই পিএইচডির রাজনীতি জারি থাকায় একজন শিক্ষককে কী নাকালই না হতে হয়। পিএইচডি করতে যদি তার চার বছর ব্যয়(নষ্ট) হয় তবে একটি এলিট-পিএইচডির জন্য তার পূর্বে ব্যয়(নষ্ট) হয় অন্তঃত দুই বছর (ভাগ্যবানদের কথা আলাদা): ইন্টারনেট ঘেঁটে ইউনিভার্সিটি খোঁজো, প্রফেসর/সুপারভাইজার খোঁজো, তাকে রাজি করাও, অ্যাডমিশন অফিসে যোগাযোগ করো, ফরম ডাউনলোড করে ফিল-আপ করো, প্রপোজাল রেডি করো– দশজনকে দেখাও, সঙ্গে দেবার জন্য রাজ্যের ডকুমেন্ট প্রস্তুত করো, রেফারেন্স লেটারের জন্য দেশের প্রফেসরদের পেছনে পেছনে ঘোরো, আরও আছে প্রসেসিং ফি বাবদ কয়েক হাজার, ডিএইচএল/ইএমএস বাবদ কয়েকশ টাকা, পাসপোর্ট বানানো/রিনিউ করা বাবদ কয়েক হাজার। এইসব দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর কাজ করতে হবে কেবল এক জায়গায় ‘লেখালেখি’-র জন্য। আপনি দশ জায়গায় লিখলে এক জায়গায় ফান্ড পাবেন। দুই পয়সার মাস্টারের দশ জায়গায় হাজার করে লাখ টাকা খরচ করার সামর্থ্যও সচরাচর থাকে না। এরমধ্যে বিরাট ফ্যাক্টর আপনি একা না অনেক। আপনার পরিবার থাকলে আরেক হ্যাপা: তাদের কোথায় রেখে যাবেন, বাচ্চা-কাচ্চা কী খাবে, কবে তাদের নিতে পারবেন, নেবার পরে কী খাবেন আর কী পর(ড়)বেন ইত্যাদি ইত্যাদি। এতোকিছুর পরে যদি একজন পিএইচডি করতে না চান, না পারেন তাকে আপনি কীভাবে দোষারোপ করবেন? তিনি যদি পিএইচডির রাজনীতিতে বিরোধীদলে চলে যান,

তার পরও আপনি তাকে ‘লেখালেখি’-র জন্য উপদেশ দেবেন?

এই নিবন্ধটি পড়ে মনে হতে পারে আমার সমালোচনায় বিদেশি ডিগ্রির মহত্ত্ব খাটো হয়ে যাচ্ছে এবং ফাঁকে দেশি ডিগ্রির মহত্ত্ব বাড়ছে। কিন্তু দেশে বসে যারা অজস্র আবর্জনা উৎপাদন করছেন তাদের নির্ভার বোধ করার কোনো সুযোগ নেই। বিদেশিরা বরং একটা সিষ্টেমের নানা পর্যায় পার হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক পেশাদারিত্ব ধরনের কিছু একটা অর্জন করেছেন। কিন্তু দেশের ডিগ্রি আরও অল্প আয়াসে পাওয়া সম্ভব। কোনো কোনো বিভাগে পিএইচডি করানো একটা অর্থনীতির ব্যাপারও হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন অধ্যাপক একই সঙ্গে সর্বোচ্চ আটটি পিএইচডি করাতে পারেন। প্রতিটির জন্য তিনি পেতে পারেন দশ হাজার করে টাকা। একজন সুপারভাইজার তাহলে চাইলে একটি আশি হাজার টাকার প্রজেক্টে নিজেকে সর্বক্ষণ নিয়োজিত রাখতে পারবেন। এরকম ‘আশি হাজারী’ সুপারভাইজাররা আবার তার পিএইচডি গবেষককে সবগুলো কমিটি (ডিপার্টমেন্টের একাডেমিক কমিটি, ডিনস কমিটি, কেন্দ্রীয় একাডেমিক কাউন্সিল ইত্যাদি) পার করিয়ে আনার দায়িত্ব নিজেই নিয়ে থাকেন। কনসাল্টেন্সির বাজারে যাদের কদর নেই সেসব বিভাগে এধরনের প্রবণতা বেশি দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা দেশ-বিদেশের নয় মোটেই, অভিসন্দর্ভের মানই প্রধান বিবেচ্য। অভিসন্দর্ভটি বিদ্যাজগতে নতুন কী যোগ করলো, নিজের ডিগ্রিলাভ ছাড়া আর কোনো কাজে লাগলো কিনা– এই বিচারই এখানে করা হচ্ছে। বিদেশি ডিগ্রির দাপট বেশি বলে ঐদিকে বেশি আলোকপাত করা হয়েছে মাত্র।

এন্ডনোটে বলতে দ্বিধা নেই, লেখকও একটি পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের ইঁদুর দৌড়ে সামিল হয়েছেন। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে লেখকেরও ওরকম একটি ডিগ্রি ভাগ্যে জুটে যেতে পারে। কারণ গুঁতোগুঁতির জন্য তারও একটি শিঙ দরকার।

ফাহমিদুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়